ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 192-199
www.athenajournalcbm.in

নকশাল আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বাংলা ছোটগল্পে প্রতিভাত জনজীবনে তার প্রত্যক্ষ অভিঘাত ও সীমাবদ্ধতা

সুবীরকুমার সেন*

প্রাপ্ত: ২৮.০২.২০২৪ পরিমার্জন: ১৩.০৩.২০২৪ গৃহীত: ২৫.০৬.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *ভারতবর্ষের নানা আন্দোলনের ইতিহাসে নকশাল আন্দোলন একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে। ইতিহাস বলে, এই আন্দোলনের উৎস দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি নামে একটি স্থান। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে এখানে যে কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল অচিরেই তা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। যা স্থান-কালের সীমা অতিক্রম করে একটা ইজম্ বা মতবাদের জন্ম দিয়েছিল। এখানকার অধিকাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর। অধিকাংশকে বর্গা প্রথায় চাষ করতে হতো। ১৯৬১ সালে সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, নকশালবাড়ি থানায় ৪৯.৭ শতাংশ জমি বর্গা প্রথায় চাষ করানো হতো। এছাড়াও নিজের হাতে ৩৭.১ শতাংশ জমিতে সম্পন্নেরা লাঙ্গল চালাতেন। সুতরাং যারা বর্গা প্রথায় চাষ করতেন, তাদের সবসময় একটা শঙ্কার মধ্যে থাকতে হতো। যে কোন মুহূর্তে তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গবদ্ধ করে নকশাল আন্দোলনে যারা গতিদান করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্য কানু সান্যাল, আজিজুল হক, চারু মজুমদার, অসীম চ্যাটার্জী, সুশীতল রায়চৌধুরী প্রমুখ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল এই আন্দোলন যখন কলকাতায় এসে উপনীত হল, তখন সেই নকশাল আন্দোলনে যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সি সহ বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা। স্বাভাবিক কারণেই নকশালবাদী আন্দোলন সমকালীন সাহিত্যেও প্রভাব ফেলল। রচিত হল, নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিচিত্র স্বাদের উপন্যাস এবং ছোটগল্প। তাদের মধ্যে-ব্রজেন মজুমদার, সুধীর করণ, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, নবারুণ ভট্টাচার্য, এবং তপোবিজয় ঘোষের লেখা বেশ কয়েকটি নির্বাচিত গল্পের উপর ভিত্তি করে মূল প্রবন্ধে খুঁজে ফেরবার চেষ্টা করা হয়েছে নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস এবং সেইসব ক্ষেত্রগুলি, যা একালের মানুষকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে।*

সূচক শব্দ: *নকশালবাড়ি, জোতদার, কমিউনিজম, ভূমিহীন কৃষক, পুলিশ, শ্রেণীশত্রু, দমননীতি, ব্যর্থতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা।*

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: subir.sen1971@gmail.com

এক

'নকশাল' শব্দটি এসেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোটগ্রাম 'নকশালবাড়ি' থেকে। বিগত শতাব্দির ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) যে কোনোদিনই বিপ্লবের পথে এগোবে না এটা পার্টির অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সময় আলোচিত ও বিতর্কিত হয়ে আসছিল। দলের অভ্যন্তরীণ আলোচনায় নিয়ন্ত্রক নেতৃত্বের পরিষ্কার বার্তা ছিল, 'এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও মানুষকে উপকার দেওয়া সম্ভব'। এর বিরুদ্ধ চিন্তাধারা তখন থেকেই সক্রিয় ছিল; যারা মনে করতো বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না করলে, মানুষকে কোনো স্থায়ী উপকার দেওয়া সম্ভব নয়।

এখানে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র একাংশ ১৯৬৭ সালে তাদের নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) একটি পৃথক উগ্র বামপন্থী দল গঠন করেন। এ বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ২৫ মে তারিখে। তখন নকশালবাড়ি গ্রামের কৃষকদের উপর স্থানীয় ভূস্বামীরা ভাড়াটে গুন্ডার সাহায্যে অত্যাচার করছিল। এরপর এই কৃষকরা ঐ ভূস্বামীদের সেখান থেকে উৎখাত করে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> '১ মে, ১৯৬৯-এ কলকাতায় ময়দানের জনসভায় কানু সান্যাল আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত পার্টি প্রতিষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে অসীম চ্যাটার্জী পার্টি গঠনের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে চারুবাবুর নকশালবাড়ী আর প্রকৃত নকশালবাড়ী এক ছিল না। সি.পি.আই. (এম. এল) গঠনের সময় সঙ্গে সঙ্গেই চীন পার্টি তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং পিপলস্ ডেইলি পত্রিকায় পার্টির প্রস্তাব মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পার্টি গঠনের সময় সি.পি.আই. (এম. এল)-এর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা যে সকলেই চারুবাবুর সঙ্গে একমত ছিলেন এমন নয়।'[১]

চারু মজুমদার চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও সে তুং এর অনুসারী ছিলেন। তিনি মনে করতেন ভারতের কৃষক এবং গরিব মানুষদের মাও সে তুং এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রেণিশত্রুদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করা প্রয়োজন। তার কারণ তারাই সর্বহারা কৃষক শ্রমিকদের শোষণ করে। তিনি নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার লেখনীর মাধ্যমে। তার বিখ্যাত রচনা হল 'হিস্টরিক এইট ডকুমেন্টস্' বা আট দলিল যা নকশাল মতাদর্শের ভিত্তি রচনা করে। বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সরোজ দত্ত শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতির পক্ষে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন নকশালদের মুখপত্র 'দেশব্রতী' পত্রিকায়। নকশালপন্থীরা পরবর্তীতে সিপিআই (এম) থেকে বেড়িয়ে 'অল ইন্ডিয়া কমিটি অব কমিউনিস্ট রেভুলশনারী' (এ আই সি সি সি আর) গঠন করেন। বাস্তবে সকল নকশালবাদী দলেরই উদ্ভব হয়েছে সিপিআই (এম এল) থেকে। পরবর্তী ক্ষেত্রে, ভেঙে যাওয়া সিপিআই (এম এল) থেকে বেরিয়ে আসা 'পিপলস ওয়ার গ্রুপ' (PWG) এবং 'মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্র' (MCC) একত্রিত হয়ে ২০০৪ সালে 'কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মাওবাদী)' গঠন করে। এছাড়া ভিন্ন মতাদর্শের আর একটি দল হল 'অন্ধ্র রেভুলশনারী কমিউনিস্টস্' এবং তারা 'টি. নাগি রেড্ডি'-র 'মাস লাইন' মতবাদের অনুসারী ছিল।

১৯৭০ সালের দিকে এ আন্দোলন অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে কয়েকটি বিরোধী অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮০ সালের দিকে প্রায় ৩০টি নকশালবাদী দল সক্রিয় ছিল এবং তাদের জনবল ছিল প্রায় ৩০,০০০। ২০০৪ সাল ভারতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসেব মতে প্রায় ৯৩০০ নকশালবাদী ক্যাডার সক্রিয় রয়েছে এবং তাদের কাছে প্রায় ৬৫০০ অনিবন্ধিত অত্যাধুনিক অস্ত্র রয়েছে, এছাড়া দেশী অস্ত্র তো আছেই। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী চরিত্রগত কারণে তেলেঙ্গানার সংগ্রামকে নেহরুর পদতলে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে কিছু নকশালবাদী দল ভারতের মূলধারার রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, যেমন: সিপিআই (এম এল) লিবারেশন। তবে নকশাল আন্দোলন নিয়ে প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়েছে। অরুন্ধতী রায় বুকার পুরস্কার জয়ী 'গড অব স্মল থিংস্' উপন্যাসে একটি চরিত্র নকশাল আন্দোলনে যোগ দেয়। মহাশ্বেতা দেবী তার 'হাজার চুরাশির মা'... সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্নর রায় রচিত বেশ কিছু উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের কথা রয়েছে। শুধু উপন্যাস নয়, বাঙালি ছোটগল্পকারদের হাতে নকশাল আন্দোলন বিভিন্ন প্রেক্ষিতে নানা মাত্রিক উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের অবস্থা একেবারেই বেহাল হয়ে পড়ে। তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা

দিয়েছিল; কিন্তু সেই স্বাধীনতা ছিল খন্ডিত স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক কারণে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করার একটা প্রচেষ্টা চলে। কারণ সেই সময়টায় বেশিরভাগ ভূমি ছিল জমিদার কিংবা জোরদারদের অধিকারে। স্বাধীনতার পরেও তার বড় একটা হেরফের হয়নি। যদিও বামপন্থী সরকার তাদের ভূমিসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভূমিহীনদের হাতে জমিদারের উদ্বৃত্ত জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেই বিষয়টা খুব সহজে হয়ে ওঠেনি। তাইতো নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যারা, তাদেরকে দেখা গেছে জমিদার এবং জোরদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, প্রয়োজনে লাঠি ধরতে। এই প্রসঙ্গটি 'খোদাহাটির ডাক' গল্পে অসাধারণ বাস্তবতায় ফুটে উঠেছে। যেখানে দেখা গেছে সাধারণ কৃষক-নেতা এবং সেইসব চরিত্রের ভিড়, যাদের আচরণ সেকালের সমাজ বাস্তবতাকে অত্যন্ত তথ্যভিত্তিক ভাবে চিনিয়ে দিয়েছে।

নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে কৃষক বিদ্রোহ, সেখানে বারংবার মতাদর্শের বিষয়গুলি এসে পড়েছে। কিন্তু কৃষকের স্বার্থ বাদ দিয়ে যেখানে কোন কোন চরিত্র নিজের আখের গোছাতে জোতদারের গুন্ডাদের সাথ দিয়েছে, সেখানেই ঘটেছে রক্তক্ষয়। তাইতো দেখা গেল, সেইসব আখের গোছানো চক্রান্তকে কেন্দ্র করে, খোদাহাটির জমি কৃষকদের জন্যে দখল করবার ডাক। গল্পে এসেছে জমিদারের গুন্ডা, এক এম.এল.এ এবং হাজার হাজার কৃষক। রাষ্ট্র শ্রেণি শোষণের হাতিয়ার। তাইতো যখনই গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত এম.এল.এ এসেছে, সে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে জমিদার ও জোতদারদের সহায়তা করে কৃষকদের সঙ্গে একটা রফা ও বন্দোবস্তের রাস্তা খুঁজতে চেয়েছে। কিন্তু আন্দোলন যেভাবে শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলনের লক্ষ্য থেকে এ গল্পের মধু মাহাতোর ছেলে সোনা কিছুতেই কোন রফার ভিতর আসতে চায় না। আর গল্পকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> 'আন্দোলন যেভাবে শুরু হয়েছে, সে ভাবেই হবে, এর অন্যথা হবেনি...অন্যান্য কৃষকেরাও রাধিকার সঙ্গে সহমত হয় না। তারা নেতা মধু মাহাতোর নির্দেশ শুনতে চায়। কিন্তু মধুকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মধুর সন্ধানে বের হয় সোনা। এ লড়াই দীর্ঘ দিনের। চাষের জমিকে ভেড়িতে রূপান্তরিত করে দেয়া হচ্ছে। দেওয়ানি মামলার রায় সোনার পক্ষে থাকা সত্বেও চাষ করতে গিয়ে দাঙ্গা হচ্ছে। শত শত বিঘে আবাদি জমি জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে যুগের পর যুগ। সোনার বুকটা টনটন করে ওঠে এ সব কথা ভাবলে। এই কালো কালো ভুতুড়ে বাঁধগুলো যেন বহু দানবের কঠিন বাহুর মতো পৃথিবীর কণ্ঠরোধ করছে।'[২]

নকশাল আন্দোলন একটা সময় বিপুল আলোড়ন তুললেও দেখা গেছে সেই আন্দোলন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। তার কারণ এই নয় যে, নকশালবাদীরা তাদের আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছিলেন। আসলে মানুষের লোভ যেখানে সত্য, সেখানে কৃষকের জমি কেড়ে নিয়ে বসিরহাট এবং ক্যানিং অঞ্চলে দেখা গেছে আবাদি জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দিয়ে মাছের ভেড়িতে পরিণত করা হয়েছে। যার দ্বারা জোতদার কিংবা তার অনুগামীরা লাভবান হয়েছিলেন। কিন্তু কৃষকদের অবস্থা সেই তিমিরে। উপরোক্ত গল্পে কৃষক আন্দোলন, এবং পরিণামে একটা বড় চক্রান্ত, লোভের কাছে কৃষকদের পরাজয়ের এই গল্প—একটা ট্রাজিক আবেগ ছড়িয়েছে।

কোন কোন গবেষক নকশাল আন্দোলনের এই সংগ্রাম ও সংঘাতের কালটিকে একটা বিপুল সংকটের কাল বলে নির্দেশ করেছেন। সেই সংকটের কালে কোন এক মুক্ত স্বাধীনতার জন্যে মানুষের অধিকারের লক্ষ্যে তরুণ-তরুণীরা স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্নের একটা বাস্তবোচিত প্রকাশ ঘটেছে গল্পকার সুধীর করণের 'সংকটের কাল' শীর্ষক গল্পটিতে। যেখানে দেখা গেল, ২৫ বছরের যুবক মধু এবং তার প্রেমিকা মানালি একটা নতুন দিনের স্বপ্নে, হঠাৎ করে নকশাল বনে গেল। কিন্তু তাদের সেই মুক্তির স্বপ্ন শাসকের কাছে একটা চরম প্রতিবাদ মনে হয়। তাদের বিরুদ্ধে নামিয়ে দেওয়া হল সরকারের হাতিয়ার পুলিশের দল। যারা মধুকে না পেয়ে তার বাপের উপর চালিয়েছে সীমাহীন নির্যাতন। তাইতো নকশাল আন্দোলন মানে একটা স্বপ্নের জাগরণ, অধিকারের লক্ষ্যে বহু তরুণ-তরুণীর যাত্রা। তাইতো দারোগা সাহেব একটা সময় এই তরুণ-তরুণীর রক্তের তেজ দেখে বলেন—'নকশাল আসলে রক্তবীজের ঝাড়। ওদের এমন করে শেষ করা অসম্ভব।'[৩]

সুতরাং শাসকপক্ষের দিক থেকেও নকশাল আন্দোলনের তীব্রতা ওদের মনে একটা সংশয় সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ

নেই। নকশাল আন্দোলনে শ্রেণীশত্রুকে নিকাশ করবার ক্ষেত্রে যেমন গরিলা আক্রমণের কথা বলা হয়েছে; তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বুঝে নকশালবাদীরা মেতে উঠল শ্রেণীশত্রুকে প্রাণে মারবার খেলায়। তাইতো যে মানালি অসম্ভব ভালোবাসতে পারে, তারাই পুলিশের চর হারাধনকে নিঃশেষ করে দেয়। আর প্রতিবাদের ক্ষেত্রে মেয়েরাই বেরিয়ে এসে নকশাল আন্দোলনকে জুগিয়েছে একটা অনন্য গতি ও সাহস।

দুই

নকশালবাদী আন্দোলন শুধু ভারতের রাজনীতি বা অর্থনীতিতেই নয়; সাহিত্যেও প্রভাব ফেলেছিল। বহু সাহিত্যিক একে উপকরণ করে কাহিনির রসদ করেছেন। সমরেশ বসুও এই আন্দোলনকে পটভূমি করে বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন। তাই তাঁর গল্পে এই আন্দোলনকে নিজস্বতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 'শহীদের মা' (১৯৭১) গল্পটিতে সত্তরের দশকের বাংলার সমাজজীবনে যে রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তার বাস্তব চিত্র রয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র বিমলা। পুত্র বাদলের মৃত্যুকে ঘিরে স্মৃতিতর্পণমূলক কাহিনিই এই গল্পের প্রধান উপজীব্য। বিমলার তিন ছেলে, এরা তিনজনই তিন পার্টির সাথে যুক্ত; স্বামী হরপ্রসাদও পার্টির মেম্বার—'চার জন চার পার্টির লোক।'[৪] স্বভাবতই পিতা ও ভাইদের মধ্যে মতানৈক্য লেগেই থাকতো, তাদের কাছে তাদের আসল পরিচয় তারা পার্টির মেম্বার। তবে নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে সমাজে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, এই পার্টির সদস্যরা উদ্ভ্রান্ত, সঠিক পথে চালিত হচ্ছে না, খুন, বোমাবাজি এদের রক্তে মিশে আছে।

সমকালীন লেখক সমরেশ বসুও এই গল্পে হরপ্রসাদ, কৃপাল ও দয়ালের মাধ্যমে এই ধারণাই ব্যক্ত করেছেন। এখানে লেখক বিমলার বক্তব্যে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে তৎকালীন ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের শিকার হয়েছে বাদল। এই সংকটের ফলে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও মাতা-পুত্রের সম্পর্কের ভাঙন ধরেছে। তাইতো বাদলের মৃত্যুতে একমাত্র বিমলাই কষ্ট পেয়েছে, অন্যরা বাদলের মৃত্যুতে শোকের ঝড়ে মুহ্যমান হয়নি। কেননা তাদের কাছে বাদলের থেকে পার্টির নির্দেশই বড়ো কথা। 'সিদ্ধান্ত' গল্পেও নকশালবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বিদ্বেষ, খুন অকপটেই চলে এসেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র তার বাবার কাছ থেকে রাজনীতিতে পাঠ নিলেও পরবর্তীতে পরস্পর বিপরীত পার্টিতে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের মধ্যে শুরু হয়েছিল মনোমালিন্য। তাদের কাছে পার্টির পরিচয়ই আসল পরিচয় হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। কুণাল বলেছে—

> 'আমাদের সংগ্রাম এবং আদর্শের কাছে পিতা-পুত্র সম্পর্কের কোনো স্থান নেই। মাতা-ভ্রাতা-ভগিনী-বন্ধু কোনো কিছুরই কোনো সম্পর্ক নেই। আছে শুধু আদর্শ ও সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা, নীতি ও কৌশলকে অকুণ্ঠ চিত্তে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রয়োজন হলে আত্মোৎসর্গ করা।'[৫]

পার্টির জন্য কুণালের প্রাণ নিবেদিত। এমনকি তার দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার বাবা-মাকেও হত্যা করবার। কাজেই একটা বিষয় স্পষ্ট যে, সেইসময় পরস্পর পার্টির লোকেরা খুন হত; এইজন্য সমাজে বিদ্বেষ ও বিশৃঙ্খলা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু আলোচ্য গল্পে কুণাল শেষপর্যন্ত পিতৃঘাতী হতে পারেনি, সে বুঝেছে পার্টির আদর্শের থেকেও সে বাবাকে বেশি ভালোবাসে। এখানেই যেন মানবতার তথা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জাগরণ ঘটেছে কুণালের মধ্যে। তাই সে আত্মহত্যার পথকেই বেছে নিয়েছে। কেননা কুণাল যদি তার পিতাকে হত্যা না করতো তাহলে তাকে দলের কাছে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন হতে হত, যার পরিণাম মৃত্যু। কাজেই লেখক কুণালের মাধ্যমে এই ধারণা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, পার্টির আদর্শ, সংগ্রামনীতি যাই থাক না কেন মনুষ্যত্বই আসল কথাটি 'বিবেক' গল্পেও (দেশ, ১৯৯৭) এসেছে নকশালবাদী আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপ। এই গল্পে স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান বিভূতি চরিত্রের মাধ্যমে প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টির প্রসঙ্গ এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে নকশালবাদী আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভূতি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। বিভূতির মাধ্যমে এখানে লেখক তৎকালীন মার্কসবাদী সমর্থকদের নীতিগত দ্বন্দ্বের দলিল তুলে ধরেছেন। এজন্য ভুল নেতৃত্বের শিকার হল সাধারণ বিবেক সম্পন্ন মানুষ। বিভূতিও বিভ্রান্ত হয়ে তার অধ্যাপক গদাধর রায়ের শরণাপন্ন হয়েছে। এমনকি তাকে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য জেলে যেতে হয়েছে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির

বিশৃঙ্খলায় জনজীবন বিপর্যস্ত। পার্টির নেতৃত্ব কখনো বলেছে সশস্ত্র বিপ্লব দরকার, আবার কখনো বলেছে সশস্ত্র বিপ্লব ভুল পথ; এ থেকেই বুঝতে পারা যায় পার্টির মধ্যে স্বেচ্ছাচার ছিল। এরফলে বহু নিরপরাধ মানুষ খুন হয়েছে। এই গল্পে বিভূতিও একজন নিরপরাধ ফেরিওয়ালাকে হত্যার ঘটনায় বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। কখোনই নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত বিভূতি ফেরিওয়ালার স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের খুঁজে পেয়েছে বেশ্যাপল্লীতে। ফেরিওয়ালার স্ত্রী কুসুম বিভূতিকে বলেছে— 'পেটের শত্তুরগুলানকে বাঁচাই বা কী করে? তাই এক ভাতার খেয়ে বারোভাতারী হইছি।'[৬] কুসুমের বারোভাতারী হওয়ার জন্য লেখক বিভূতির মতো বিবেকহীন রাজনৈতিক নেতাদেরই দায়ী করেছেন। লেখক সমরেশ বসুরও ধারণাও এটাই ছিল যে, নকশালবাদী আন্দোলন ভুল পথে চালিত হওয়ার জন্য সমাজজীবনে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ নকশালবাদীরা মূলত কৃষকদের পাশেই দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, কৃষকদের সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। শুধু ভুল পথে চালনার জন্য নকশালবাদীরা জনগণের সমর্থন পেল না, লেখক এই পটভূমিতেই 'বিবেক' গল্পের বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যারা নকশাল আন্দোলনের নির্মমতা অর্থাৎ আন্দোলনকারী-দের উপর সীমাহীন অত্যাচারের ছবি এঁকেছেন, তাদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবী বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মহাশ্বেতা দেবী ১৯৪২ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে কিশোর বাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৪ সালে বিজয়গড় কলেজের ইংরেজির অধ্যাপিকা রূপে যোগ দেন এবং একটানা ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন তিনি। তার সম্পর্কে অধ্যাপক অশোককুমার মিশ্র লিখেছেন—

> '৬০-এর দশক থেকেই আদিবাসীদের জীবন নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন কেননা তিনি জানিয়েছেন ১৯৬৫ সালে পালামৌ বেড়াতে গিয়ে প্রথম আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে জানতে পারেন। ৭০-এর দশকে শুরু হয় নকশাল আন্দোলন। নকশালরা আদর্শের জন্য যেভাবে প্রাণত্যাগ করেছে সে সময় তা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন মহাশ্বেতা।'[৭]

মহাশ্বেতা দেবী 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসটির জন্য বিপুল মহিমায় নকশাল আন্দোলনের সাহিত্য রচনায় প্রসারিত হয়ে আছেন। যেখানে তিনি নকশাল আন্দোলনে ব্রতী প্রতিবাদী তরুণদের উপর সীমাহীন পুলিশি-অত্যাচারের ছবি এঁকেছেন। তবে এই উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি জানিয়েছেন, নকশাল আন্দোলনে প্রতিবাদী ছেলেদের প্রতি যে পুলিশি-অত্যাচারের খবর, তিনি খবরের কাগজে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পড়েছেন; কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির ছেলেদের উপর যে নির্মম অত্যাচার – তারই পটে তিনি তার লেখার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি দেখেছেন জঙ্গলমহলে আদিবাসী মানুষগুলির উপর প্রশাসনের সীমাহীন অত্যাচার। যেমন 'বিছন' গল্পে দেখা গেছে, রাজপুত লক্ষ্মণ সিং এবং মহাজনেরা গরিব মানুষগুলির উপর অমানসিক অত্যাচার করে। শুধু তাই নয়, তাদের বিনা বেতনে খাটিয়ে নেয়।

সেই অত্যাচার যখন গরিব মানুষগুলির পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দেয়, তখন প্রতিবাদে তারা ভয় পায় না। অত্যাচারিত মানুষগুলি একপ্রকার বাধ্য হয়েই হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। কিন্তু সুসংগঠিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা খুব সহজ নয়। তাইতো 'দ্রৌপদী' গল্পে দেখা গেল, এক নারীর উপর সীমাহীন অত্যাচারের ছবি। যেখানে একটা পৌরাণিক অনুষঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী নকশাল আন্দোলনের অত্যন্ত একটা বাস্তবোচিত ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

'দ্রৌপদী' গল্পের শুরুতেই আছে প্রশাসনিক হুলিয়া-দ্রৌপদী মেঝেনের নামে। ২৭ বছরের দ্রৌপদী, যে নিহত দুলন মাঝির বৌ—সে বাঁকড়াঝার এলাকায় থানা আক্রমণ, বন্দুক অপহরণ, জোতদার, গোলদার মহাজনদের ত্রাস। তাকে ধরার জন্য এসেছে অপারেশন বিশেষজ্ঞ অর্জুন সিং। হিংসা দিয়ে হিংসা জয়ের সাধনা তাঁর। মৃত্যুর আগে গুলিবিদ্ধ দুলন ডাক দিয়ে যায় 'মা হো'। লড়াইয়ের ডাক এটা। এদিকে টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করে খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ারী। দ্রৌপদী তাকেও শেষ করে দেয়। দ্রৌপদী প্রশাসনের ঘুম কেড়ে নেয়। তার নামে একশ' টাকা হুলিয়া জারি হয়। উপী মেঝেন নাম নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে থাকে—তার অবর্তমানে আন্দোলন যাতে না স্তব্ধ হয়ে যায় তাই সে মুসাই টুডুর বউয়ের সঙ্গে কথা

বলে নেয়। গল্পে আছে সাধারণ মানুষের জল সঙ্কটের কথা, ফসলের সঙ্কটের কথা। অথচ কৃষক শোষক সূর্য সাউয়ের বেশ বাড়বাড়ন্ত। সূর্য সাউকে হত্যা করে সে, এরপর চায় ঝাড়খালির জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে। কিন্তু পারেনি সে। পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তার উপর শুরু হয়েছে পাশবিক দৈহিক নির্যাতন। দ্রৌপদীর কাপড় গা থেকে টেনে ফেলে দেয়। তারপর তার দুই মর্দিত ক্ষতবিক্ষত স্তন দিয়ে সেনানায়ককে ঠেলতে শুরু করে—

'এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।'[৮]

দ্রৌপদী নামকরণ এবং শেষ পর্যন্ত তার উপর পুরুষদের অবর্ণনীয় যৌন অত্যাচার যেন মিলে মিশে মহাভারতের আর এক প্রতিবাদী নারীর কথা ক্ষণকালের জন্য হলেও মনে জাগায়—সে অর্জুন-জিতা দ্রৌপদী। যার বস্ত্রহরণ করেছিল দুঃশাসনেরা। কিন্তু ম্লান হয়নি সে, কেননা তার নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব।

তিন

মহাশ্বেতা দেবীর উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলা ছোটগল্পে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নবারুণ ভট্টাচার্য। তিনিও তার মায়ের মত যে সকল নকশাল আন্দোলনের উপরে ভিত্তি করে গল্প লিখেছেন তার মধ্যে 'খোঁচড়' একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। যেখানে পুলিশের অত্যাচার কি নির্মম হতে পারে তার বর্ণনা অতি বাস্তবতায় উপস্থাপিত—

'ঢাউস ভ্যানটা এগিয়ে এসেছিল। দরজার দুটো পাল্লা হাঁ হয়ে আছে। ও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লাশ ওঠাতে বলে... হাতটা ধরে উঁচু করে ঝুলিয়ে একজন ভ্যানের মধ্যে ঢুকে যায়...মাথাটা একবার ঠুকে যায় পা-দানিতে—পাগুলো বাইরে বেরিয়েছিল...ভেতর থেকে টানার ফলে অন্ধকারে ঢুকে যায় মৃতদেহ। এক পায়ে চটি ছিল না। খুন! লাশচুরি! সারাটা রাস্তা ফোঁটা ফোঁটা রক্তাক্ত! রক্ত মৃতদেহ...।'[৯]

সত্তরের দশক মানেই একটা অস্থিরতার কাল। স্বাধীনতা-উত্তর সেই সময়ে সারা বাংলাদেশ জুড়ে চলেছিল যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সেই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আবর্তে আবর্তিত যারা হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে লেখক তপোবিজয় ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সাহিত্যের ইতিহাস বলে, তিনি সাংবাদিক রূপে 'যুগান্তর', 'বসুমতী', 'সত্যযুগ' ছাড়াও 'মাসিক বাংলাদেশ', 'লেখা ও রেখা' ইত্যাদি পত্রিকায় তিনি, একের পর এক সত্তরের দশকের জীবনের নানা ওঠাপড়া নিয়ে, একের পর এক গল্প লিখে চলেছেন। তিনি দেখেছিলেন, সত্তরের দশকে কিভাবে দুর্নীতি এবং মজুতদারীর স্বাভাবিক ফলস্বরূপ কিভাবে বাংলাদেশে প্রতিটি জিনিসের মূল্য সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল তরুণ সমাজের যে প্রতিবাদ, তাকে নিঃশেষ করে দিতে সরকারের সীমাহীন দমন-নীতি। তার 'এখন প্রেম' গল্পে তিনি অসাধারণ বাস্তবতায় দেখিয়েছেন। সেকালের কলকাতার অলিতে-গলিতে বোমাবাজি, খুন, রাহাজানি এবং রক্তাক্ত হানাহানি কিভাবে দুটি তরুণ-তরুণীর স্বাভাবিক জীবনকে বিষময় করে তোলে। যেখানে সেই বিপর্যস্ত পরিস্থিতির চাপে ঘরের যুবক ছেলেকে সিনেমা হলের টিকিট ব্ল্যাক করতে হয়। খুনোখুনির ভয়ে কথা দিয়েও সীতেশ সিনেমা হলে টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে থাকলেও, কৃষ্ণা সময় মত আসতে পারে না। এ গল্পে সরাসরি নকশাল আন্দোলনের বিস্তারিত বর্ণনা নেই; কিন্তু সেই সময়কার সামাজিক বাস্তবতাকে অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে তপোবিজয় ঘোষ তুলে ধরেছেন। কৃষ্ণা বলেছে সেই সময় বেঁচে থাকবার একটা দারুন পলিসি—

'সার্কাসে দেখো নি? একটা সরু তারের ওপর দিয়ে ছাতা হাতে মেয়েরা কেমন সন্তর্পণে হেঁটে ওপারে পৌঁছে যায়? আমাদের বাঁচাটাও তেমনি, রকমারি সমস্যার সরু তারের ওপর দিয়ে হাঁটা চলা। বেড়ে ওঠা। আর এই রঙচঙে আমাদের ভালোবাসা জীবনের ব্যালান্স রাখে।'[১০]

এমনই কোন একটা দিন কৃষ্ণার বাড়িতে এসেছিল সীতেশ। সন্ধ্যা পেরতেই হঠাৎ শুরু হয়ে গেল বাড়ির বাইরে বোমাবাজি। কৃষ্ণার মা না চাইলেও নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সীতেশ রয়ে গেল কৃষ্ণার বাড়িতে। কৃষ্ণার ভাই বাড়িতে নেই, নকশাল আন্দোলনের যুক্ত বলে পুলিশ তাকে খুঁজছে। তাইতো ভাইয়ের ঘরে অনেক রাতে সীতেশের কাছে এলো কৃষ্ণা। জানালার বাইরে তারা দেখলো রাস্তার উপর বেশ কয়েকটা পুলিশের গাড়ি। অন্ধকার আলো-ছায়ায় কাদের যেন যাওয়া-

আসা। মনে হয় ওই পুলিশের দল কারো অপেক্ষায় লুকোচুরি খেলছে। হয়তো সামনে পেলেই গুলি করে দেবে। জানালাটা খোলা রেখে কি একটা আবেগে সীতেশ কৃষ্ণার কাছে নিবিড় হয়ে আসতেই হঠাৎ একটা গুলির শব্দ। সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়, বুট জুতোর শব্দ তুলে ক'জন পুলিশ ছুটে আসছে। হাতে উদ্যত রাইফেল, মুখে-চোখে জান্তব উল্লাস যেন এতক্ষণে ফাঁদ পেতে একটা শিকার ধরতে পেরেছে ওরা। তাদের দুজন একটি তরতাজা যুবকের দেহ দু'পা ধরে উচিয়ে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। অরণ্যের হিংস্র প্রাণী অনেক চেষ্টায় ধাবমান কোনো হরিণ নিহত করে, ঘাড়ে-গলায় দাঁত বসিয়ে টেনে হিঁচড়ে যেমন নিজের ডেরায় নিয়ে যায়-ঠিক তেমনি। সীতেশ বললে দেখ—

> 'যুবকটির মুখ থেৎলে গেছে, চোখ ছুটো বিস্ফারিত, সারা শরীর রক্তে মাখামাখি। ঘন কালো চুলে ঢাকা মাথাটা শক্ত পীচের রাস্তায় রক্তের ছাপ ফেলে ঘষা খেতে খেতে আসছে। গাড়ির কাছে এনে খোলা দরজা দিয়ে পাটাতনের উপর সশব্দে ছুঁড়ে দিল দেহটা। সম্ভবত ছেলেটা তখনও বেঁচেছিল, কেননা শেষবারের মত একটা তীব্র ক্রুদ্ধ গোঙানি যেন শোনা গেল। সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য দেখা মাত্র দু'হাতে মুখ ঢেকে কৃষ্ণা আর্তনাদ করে উঠল।'[১১]

শুধু তপোবিজয় ঘোষের এই 'এখন প্রেম' গল্পটি নয়; তার সমসাময়িক বহু গল্পকারের গল্পে নকশাল আন্দোলন ও তার বিরুদ্ধে সরকারের দমন-নীতি এবং তার বীভৎসতা, বহু মানুষকে এমন করে একটা ভয়ানক ট্রমার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সুতরাং নকশাল আন্দোলন আমাদের সমাজের শুধু একটা সংকট নয়, সেই সংকটে যারা আবর্তিত তাদের মানসিক ট্রমা আরো অনেকের গল্পে ধরা পড়েছে। সেই গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখ- সমরেশ বসুর 'স্বীকারোক্তি'।

যেখানে দেখানো হয়েছে একটি যুবককে নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার অপরাধে এরেস্ট করে নিয়ে আসা হয়েছে। এ জেল থেকে সে জেল। সেখানে তাকে জেরার নামে তার উপর একের পর এক মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। কখনো তার সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা পাগল। যে সারা রাত কথককে একটুও ঘুমাতে দেয়নি। তাকে যে ঘরে জেরার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার আশেপাশের ঘরে আলো অন্ধকার পরিবেশ। টেবিলের উপর একটা মানুষ উপর হয়ে পড়ে আছে। এভাবেই 'স্বীকারোক্তি' গল্পে যারা নকশাল বন্দী, জেলের ভিতর তাদের কিরকম জীবনের অবস্থা সমরেশ বসু তার ছবি এঁকেছেন। সেখানে এসেছে ভীষণ দারোগা, অত্যাচারী ইন্সপেক্টর কিংবা; সেইসব মানুষগুলি, যারা বারংবার বন্দীদের মনোবল ভেঙে দিয়ে তাদের একটা ট্রমার মধ্যে চালান করে দেওয়া।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কর্মসূচীতে বলে: এই দেশ কৃষক জনসাধারণের দেশ; তারাই আমাদের দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগের বেশি। অথচ এরা সর্বাপেক্ষা শোষিত। এই প্রেক্ষাপটে সি.পি.আই. (এম.এল) স্থির করেছিল যে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ হলো ভারতীয় বিপ্লবের পথ। এ প্রসঙ্গে চারু মজুমদার লেখেন যে পার্টি দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে যে খতম অভিযান শুরু হয়েছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এলাকায় এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথে। খতম অভিযানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো, গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে কৃষকদের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করা। নকশালবাদীদের তথ্যানুযায়ী ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে গোপীবল্লভপুর ইত্যাদি অঞ্চলে খতম অভিযান শুরু হয়। জমিদাররা অনেকে পালিয়ে যায়, আর ছোট জোতদাররা আত্মসমর্পণ করে। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সংযোগ ঘটে ও কিছু কিছু বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর জন্ম হয়। প্রশাসন রাজ্যের বাহিনীর উপর নির্ভর না করে, কেন্দ্রীয় সরকারের আধা-মিলিটারী ফৌজ পাঠালে, গেরিলা বাহিনীর কার্যক্রম যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাঁরা ত্রিমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হন। চারু মজুমদারের নির্দেশে আঞ্চলিক কমিটি খড়গপুর, সাঁকরাইল, কেশপুর, চাকুলিয়া থানা এলাকার গ্রামাঞ্চলে কৃষক-সংগ্রামকে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, 'বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস' অর্থাৎ হিংসা দিয়ে পৃথিবীর কোন সমস্যাই সমাধান করা যায় না। কারণ, একটা হিংসার পরিণামে আরো বহু হিংসার জন্ম হয়। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, নকশাল আন্দোলনের উগ্রতা সর্বোপরি গণতান্ত্রিক সেট-আপের মধ্যে কারো কারো শেষ আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শ এবং আবেগের আতিরেক—যেগুলি বাংলা সাহিত্যের গল্পকারেরা যখন লিখেছেন, তখন তাদের

সেইসব গল্পে অবধারিতভাবে এসে পড়েছে সেই দীপ্ত তরুণদের আবেগ; যারা ঠিক কিংবা ভুল—যাই হোক না কেন, একটা শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন তারা দেখেছিল। তাদেরকে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। কাউকে রাতের অন্ধকারে মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিংবা যে ছেলেটি হাসতে হাসতে তার মাকে বলে গিয়েছিল 'আসি'; যে উদাত্ত স্বরে বন্দী জীবনে মুক্তির গান গেয়েছিল, নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা হয়তো তাই সেই আত্ম-উৎসর্গ করা, আমাদের ছেলেগুলির জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

সূত্র নির্দেশ:

১. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, (২০২০), *বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও নানা আন্দোলনের ইতিকথা*, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ. ২৯৮।
২. ঘোষ, বিজিত, (২০০৮), (সম্পা.), *নকশাল আন্দোলনের গল্প*, পুনশ্চ, পৃ. ১০৮।
৩. *তদেব*, পৃ. ৫৪।
৪. *তদেব*, পৃ. ৩৭।
৫. বসু, সমরেশ, (১৪০১), *গল্পসমগ্র-২*, মৌসুমী প্রকাশনী, পৃ. ১৮৬।
৬. *তদেব*, পৃ. ১৯২।
৭. মিশ্র, অশোককুমার, (২০১৭), *বাংলা ছোটগল্পের রূপরেখা (১৮৮৪-২০১৬)*, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, পৃ. ৩২১।
৮. ঘোষ, বিজিত, (২০০৮), (সম্পা.), *নকশাল আন্দোলনের গল্প*, পুনশ্চ, পৃ. ৫২।
৯. ভট্টাচার্য, নবারুণ, (২০১৮), *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮১।
১০. ঘোষ, তপোবিজয়, (১৯৬১), *নির্বাচিত তপোবিজয় ঘোষ*, বুকমার্ক, পৃ. ৭৬।
১১. *তদেব*, পৃ. ৮৩।